Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 103 –111
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সমাজ এবং একটি মেয়ের জীবনসংগ্রাম ও জীবনভোগের খণ্ডচিত্র : বিভূতিভূষণের 'বিপদ'

A vignette of society along with the struggles and aspirations of girl in Bibhutibhusan's 'Bipod'

অয়ন্তিকা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী
ইমেইল : ayantikaasru@gmail.com

Keyword
Rural life, Poverty, Prostitutions, Social-reformation, Conflict.

Abstract
Bibhutibhushan's writing is marked by a holistic appreciation of Nature in her affectionate pesonage and her relationship with the intricacies of human mind. Experiences enrich the mind of the men of letters. Their writings drink deep from both the wells of these experiences and their imagination. Bibhutibhushan created some dreamy and surreal settings for his works where his protagonists live in close proximity of Nature. Their friendship and harmony with Nature are unquestionable. His works dwell on the simple, daily, apparently insignificant experiences of common people. Many of his short stories focus on the lives of simple villagers amidst the lush flora and fauna of rural Bengal. These writings calm the mind of the reader. But he also, as a conscious observer of human condition, portrays the ambiguities of the social life of rural Bengal.

Bibhutibhushan has narrated in this story of a teenage married girl, who is also a mother, grown up amidst Nature, who is forced to take on the life of a prostitute under dire circumstances. This paper questions whether is it normal for a girl to accept prostitution as a job biding adeu to her past life? Can prostitution ever be a voluntary choice as a profession?
Or, can morality have a place where the very physical existence is minimized to abject penury?
This paper intends to create a space of discourse relating to these questions with a close analysis of Bibhutibhushan's short story "Bipod".

Discussion

বিভূতিভূষণ প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সাথে সাথে এক অদ্ভুত, অনায়াস ভঙ্গিতে, নিবিড় দক্ষতায় তিনি মানুষের ছবি এঁকেছেন। বিভূতিভূষণের লেখায় এক অদ্ভুত আটপৌরে জীবনবোধ থাকে। যে জীবন ধীর-স্থির গতিতে বয়ে চলেছে

তার নিজস্ব ছন্দে আর তারই তীরে বসে বিভূতিভূষণ যেন সেই নিরবিচ্ছিন্ন বয়ে চলাটুকু উপভোগ করছেন। এই দেখা তাঁকে,তাঁর লেখাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। বিভূতিভূষণের লেখা এতোটাই বাস্তব, এতোটাই নিজের যে পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় গল্পের স্থান-কাল-পাত্র এগুলির কোনটাই যেন শুধুমাত্র আর লেখার পাতায় আটকে নেই। যেন আমাদের আশেপাশের পরিচিতজনেদের দৈনন্দিনতাকেই বর্ণনা করেছেন তিনি। আসলে বিভূতিভূষণ কোনদিন নিজের পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করে যাননি। সেই কারণেই তাঁর যুগের অন্যান্য লেখকদের মতো তাঁর লেখায় সমকালিনতার অভাব রয়েছে বলে অনেকে মনে করলেও আসলে বিভূতিভূষণ ভীষণভাবে সমকালীন। সমকালিনতা তো কেবলমাত্র নাগরিক জীবনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেনা।বিভূতিভূষণ তাঁর লেখায় গ্রামবাংলার প্রাত্যহিক চালচিত্রের ছবি এঁকেছেন। আপাতদৃষ্টিতে গ্রামের জীবন শহরের জীবনের তুলনায় অনেকটাই স্থবির। দিন থেকে রাত হয়ে আবার পরের দিন- এ যেন নিজস্ব এক নিয়মের ছন্দে বাঁধা। অনেক লেখক এবং হয়তো বা অনেক পাঠকের কাছেও তাই গ্রামকেন্দ্রিক জীবনযাপনের দিনলিপি একঘেয়ে মনে হতে পারে আর সেখানেই বিভূতিভূষণের মুন্সীয়ানা। এমন এক আশ্চর্য সহজ মেঠো সুরের মায়ায় শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর পাঠককে আবিষ্ট করে রাখেন যে গল্পশেষের পরেও তার আবেশ একইরকম থেকে যায়।

বিভূতিভূষণের অধিকাংশ লেখাতেই কেন্দ্রিয় চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে পল্লিবাংলা। পল্লিবাংলা এবং পল্লিবাংলার সহজ- সরল মানুষ, তাঁদের সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না নিয়ে উপাখ্যান রচনা করেছিলেন বিভূতিভূষণ। সেই উপাখ্যানে প্রকৃতি আর মানুষ একে অপরের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যেন একে অন্যের প্রতিচ্ছবি। ব্যক্তি বিভূতিভূষণের সঙ্গে গ্রামবাংলার যোগাযোগ অমলিন, আত্মিক সেই যোগ এবং লেখক বিভূতিভূষণও এই বিষয়ে সমমনস্ক। গ্রামের যে সকল চরিত্রদের কেন্দ্র করে তিনি সাহিত্য রচনা করতেন তাঁরা যেন লেখকের স্নেহস্পর্শে, মায়ায় সাধারণ থেকে অসাধারণত্বে উন্নীত হয়েছে। 'ছোট প্রাণ' - এর 'ছোট ছোট দুঃখ - কথা'[১] গুলিকে তিনি এতো নিপুণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতেন যে পড়তে পড়তে অনেক সময়েই আমাদের মনে হয় আমরা তো এভাবে ভাবিনা; ভাবতে পারিনা। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পগুলি যেন একেকটি মণিমুক্তোর মতো। প্রতিটি গল্পের মূল চরিত্রটি, মূল সুরটি আমাদের মনে দীর্ঘকালীন ছাপ ফেলে রাখতে সমর্থ হয়। গল্প পাঠের পরেও এক দীর্ঘস্থায়ী রেশ থেকে যায় পাঠকের মনের মধ্যে। শহরে থাকলেও গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। নিজেকে তিনি সারাজীবন গ্রামেরই একজন ভেবেছেন এবং তাঁর লেখা গল্পগুলি যেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আরও ভালো করে বিষয়টি বোঝা যায় যখন দেখা যায় কাহিনীতে বিভূতিভূষণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি রয়েছে অর্থাৎ তিনি নিজেকে সেই গল্পের চরিত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন - 'বিপদ', 'ভন্ডুলমামার বাড়ি', 'আহ্বান' ইত্যাদি গল্পে।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য যেন জীবন থেকে উঠে আসা। তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সূক্ষ্ম মানবিকতাবোধের মিশেলে নির্মিত হতো প্রতিটি কাহিনী আর সেইকারণেই প্রত্যেকটি কাহিনী স্বতন্ত্র। আমাদের আলোচ্য 'বিপদ' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। গ্রামীণ পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে মেয়েদের জীবনযাপনের এক দুঃসহ কষ্টের কাহিনী এই গল্পটি।

'বিপদ' গল্পটিতে লেখক নিজের গ্রামের মেয়ে হাজুর কথা লিখেছেন। একটি বিবাহিতা কিশোরী মেয়ের বেঁচে থাকা, তার জীবনধারণ প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে কীভাবে আক্ষরিক অর্থেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী এক জীবনসংগ্রামে পরিণত হয়ে যেতে পারে সেই কাহিনী শুনিয়েছেন তিনি।

কাহিনীর শুরু একটি সকালবেলার ঘটনা দিয়ে।লেখক সাহিত্যচর্চায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেছেন এমন সময়ে একটি অল্পবয়সী মেয়ে তার শিশুপুত্রটিকে নিয়ে উপস্থিত হয়।লেখক তাঁকে চিনতে না পারলে মেয়েটি তাঁকে নিজের পিতৃপরিচয় জানায়। লেখক চিনতে পারেন এবং স্বাভাবিক সৌজন্যবশতঃ কিছু সাধারণ কুশল প্রশ্নও করেন। জানা যায় মেয়েটি কাজের খোঁজে এসেছে। এইখানে দুজনের কথোপকথনে বিষয়টি একটু পরিষ্কার হবে-

> "- লোক? না, লোক তো আছে গয়লা-বৌ। আর লোকের দরকার নেই তো।
>
> - কেন? থাকবে কে?

- আমিই থাকতাম। আপনার মাইনে লাগবে না,আমাদের দুটো খেতে দেবেন।
- কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ি?"[২]

মেয়েটি নিরুত্তর থাকে। লেখকও বিশেষ আগ্রহ বোধ করেননা। তাঁর মনে হয় –

> "অতশত হাঙ্গামাতে আমার দরকার কি? লেখার দেরি হইয়া যাইতেছে। সোজাসুজি বলিলাম - না, লোকের এখন দরকার নেই আমার।"[৩]

একটি প্রায় কিশোরী মেয়ে নিজের সন্তানকে নিয়ে কেন কাজের খোঁজে এসেছিল, অর্থের পরিবর্তে কেনই বা সে শুধুমাত্র খাদ্যের সংস্থান চেয়েছিল! লেখকের মনে সামান্য কৌতূহলের উদ্রেক হলেও শ্বশুরবাড়ির প্রসঙ্গে সে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকায় লেখকও ঐ প্রসঙ্গে কথা বাড়াতে চাননি। আমরা যদি একান্তই ধরে নিই যে, কন্যাসমা একটি মেয়েকে একেবারেই প্রাথমিক আলাপে আরও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে লেখক বিড়ম্বিত করতে চাননি অথবা সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে তাঁর 'রুচিসম্মত নয়' বা 'মেয়েলি' মনে হয়েছিল তবুও 'হাঙ্গামা' শব্দটির প্রয়োগে কোথাও যেন মনে হয় মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে লেখক নিজেকেও বিড়ম্বিত করতে চাননি।
হাজু গ্রামের গৃহস্থ বাড়িগুলি থেকে ভিক্ষা করে, চেয়ে - চিন্তে চাল সংগ্রহ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। বাঙালিদের 'বারো মাসে তেরো পার্বণ' এবং গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে বিভিন্ন উৎসব - অনুষ্ঠান, ব্রত ইত্যাদির আয়োজন প্রায়শই হয়ে থাকে। এরকমই এক পার্বণের দিনে হাজুর সাথে লেখকের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। অক্ষয়-তৃতীয়ার পুজোর দিনে গ্রামের রায়বাড়িতে কলসী-উৎসর্গ উপলক্ষে হাজু ভিক্ষা করে চাল এবং কিছু ফল জোগাড় করেছিল। এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটির একটু বিশেষত্ব রয়েছে। যে সময় লেখক তাকে দেখেছিলেন সে প্রসাদে পাওয়া ফল খাচ্ছিল। লেখকের নিজের কথায়–

> "রায়েদের বাহিরে ঘরের পৈঠায় বসিয়া সেই মেয়েটি হাউহাউ করিয়া একটুকরা তরমুজ খাইতেছে। যেভাবে সে তরমুজের টুকরাটি ধরিয়া কামড় মারিতেছে, 'হাউহাউ' কথাটি সুষ্ঠুভাবে সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ঐ কথাটাই আমার মনে আসিল।"[৪]

লেখক খুব সচেতনভাবে এই শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন। সাধারণতঃ মাত্রাতিরিক্ত ক্ষুধা বোঝাতে অথবা তীব্র ক্ষিদের মুখে কোন মানুষ যখন খাবার খায় তখন সেই তীব্রতা বোঝানোর জন্য অনেকসময় এই 'হাউহাউ করে খাওয়া' কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লেখক হাজুর খাওয়া দেখে, তার ক্ষুধার তীব্রতা দেখে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন হাজুর অধিকাংশ দিনই অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে কাটে। কিছুটা কৌতূহলের বশেই তিনি হাজুর সম্বন্ধে খোঁজখবর করে তার পারিবারিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জানতে পেরেছিলেন। মেয়েটির বাপের বাড়ির অবস্থা কোনদিনই খুব একটা ভালো ছিলোনা, বাবার মৃত্যুর পরে আরও দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে তারা। আর অন্যদিকে স্বামীর অবস্থাও এতোটাই খারাপ যে দুবেলা সামান্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করাও তাদের জন্য অসম্ভব। সেই কারণে হাজুর স্বামী নিজের স্ত্রী ও দু-বছরের শিশু পুত্রটিকে তার বাপের বাড়ি রেখে গেছে। নিতান্ত অপারগ হয়ে নিজের ও নিজের সন্তানের খাবারের জোগাড়ের ব্যবস্থা হাজুকেই করতে হয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভিক্ষাবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় উপায় সে দেখতে পায়না। অবশ্য তার আরও একটা কারণ হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে খুব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ না হলে বাড়িতে একাধিক কাজের লোক রাখার চল ছিলোনা তাই কাজ খুঁজেও হাজু তার মায়ের মতো 'ঝি-বৃত্তি' পায়নি।

কাহিনী যত এগিয়েছে তত হাজুর চরিত্রের অন্যান্য দিকগুলি লেখকের সামনে উঠে এসেছে। গ্রামে হাজুর 'চোর' অপবাদ জুটেছে। তিনি অবাক বিস্ময়ে প্রকৃত সত্য জানতে চেয়ে কারণ অনুসন্ধান করলে তাঁর সামনে উঠে এসেছে এক রূঢ় বাস্তব। যে বাড়িতে হাজু কাজ করতো সেই বাড়িতে সে চাল-দুধ ইত্যাদি খাবার জিনিস চুরি করতো।গয়লা-বৌ বলে,

"- আর বড্ড খাইখাই- কেবল খাবো আর খাবো।"[৫]

হাজুর ক্ষুধাবোধকে গয়লা-বৌয়ের 'হাতির খোরাক'-র সাথে তুলনীয় মনে হয়েছে।

চুরির করার কারণ জেনে লেখক আরও বিস্মিত হয়েছেন। সামান্য খাদ্যের জন্য একটি মেয়েকে এইভাবে প্রতিনিয়ত হেনস্থা হতে হয় জেনে তাঁর দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তারপর থেকে মেয়েটি সামর্থ্য অনুযায়ী নানাভাবে সাহায্য করতেন। কিন্তু দীর্ঘকালীন কোন সমস্যার সমাধান তো এইভাবে হতে পারেনা, হয়ও নি। তাই লেখকের সামান্য সাহায্যে হাজুর অন্নসংস্থানের ক্ষেত্রে সাময়িক সুরাহা হলেও স্থায়ী কোন সমাধান হয়নি।

কিছুদিন পরে আরেকটি ঘটনা ঘটে। গ্রামের মধু চক্রবর্তী হাজুর একমাত্র সম্বল ঘটিটি কেড়ে নিয়েছেন এবং শুধু তাইই নয়; তিনি হাজুকে মেরেওছেন।লেখক এই ঘটনাটি জেনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর কথা থেকেই পাঠক জানতে পারেন লেখক গ্রামের একজন 'মাতব্বর' এবং 'পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী' অর্থাৎ গ্রামে তাঁর যথেষ্টই প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। সেই অধিকারবলেই তিনি মধু চক্রবর্তীকে হাজুর ঘটিটি ফিরিয়ে দিতে বলেন। 'মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা' - তাঁর কাছে 'ইতরের মতো কান্ড'। আর হাজুকেও ভবিষ্যতে কোনদিন মধু চক্রবর্তীর বাড়িতে ভিক্ষা করতে যেতে বারন করেন। কিন্তু মধু চক্রবর্তী ঠিক কি কারণে এই ধরণের আচরণ করেছিলেন? লেখকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন,

"হ্যাঁ দাদা, এক ঘা মেরেচি ঠিকই। রাগ সামলাতে পারি নি, ও আস্ত চোর একটি।"[৬]

তাঁদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে গিয়ে লঙ্কাগাছ থেকে পোয়াটাক কাঁচাপাকা লঙ্কা নিজের কোঁচড়ে ভরেছে সে আবার আগেও একদিন পাকা পেঁপে ভেঙ্গে নিয়েছিল – এই হল হাজুর চুরির নমুনা; যার জন্য তাকে মার অবধি খেতে হয়েছে, অপমানিত - লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

এরপরে এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। দেশজুড়ে তীব্র আকাল। যাঁদের সামান্যতম সঙ্গতি রয়েছে তাঁরা কোনক্রমে নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। পরিস্থিতি এতোখানি দুঃসহ হয়ে উঠেছিল যে মানুষ বাধ্য হয়েছিল নির্মম হয়ে উঠতে। অসহায় ভিক্ষুককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও যেন সেইসময় বিলাসিতার নামান্তর। এরকম দুর্দশার সময়েও হাজু নিয়মিত তার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়াতো। লেখক তাঁকে নিজের বাড়িতে প্রসাদ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলে সে সানন্দে উপস্থিত হয়। দীর্ঘদিনের উপবাসী, অভুক্ত মানুষ অনেকদিন পরে ক্ষুন্নিবৃত্তির সুযোগ পেলে যতটা আনন্দ পায় হাজুও সেরকম আনন্দ পেয়েছিল লেখকের কথায়। হাজুদের প্রতিবেশী হরিদাস বৈরাগীর কাছ থেকে লেখক জানতে পারেন তার শ্বশুরবাড়ি না যাওয়ার প্রকৃত কারণ। সেখানেও 'পেটুক', 'চোর' প্রভৃতি বদনাম জুটেছে তার। কারণ কিন্তু সেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই। খাবার জিনিস চুরি, লুকিয়ে খাবার খাওয়া এইটুকুই তার অপরাধ। সামান্য খাবার খাওয়ার কারণে 'চোর' অপবাদ দেওয়ার ঘটনাটি লেখকে স্বাভাবিকভাবেই অবাক করেছিল। তবে এও জানা যায় হাজুর স্বামী-শ্বশুরকুলের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয় তাই এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তারা নিজের স্ত্রী-সন্তানকে রেখে যায়, ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয় না আর হাজুও ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় না।

এরপরে বেশ কিছুদিন লেখকের সঙ্গে হাজুর কোনো রকম দেখা - সাক্ষাৎ হয়না। হঠাৎ একদিন তার এক প্রতিবেশিনী মারফৎ লেখক জানতে পারেন হাজু 'বনগাঁয়ে নাম লিখিয়েছে'। এই নাম লেখানোর বিষয়টি সম্বন্ধে লেখক নিজেই জানিয়েছেন,

"এদেশে নাম লেখানো বলে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করাকে।"[৭]

হাজুর এহেন পরিণতিতে তিনি বিস্মিত হয়েছেন, দুঃখিতও হয়েছেন।

'বিপদ' গল্পের মূল চরিত্র হাজু নামের এই মেয়েটি। হাজুর চরিত্রটিকে বুঝতে গেলে তার জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে জানতে হবে। বিভূতিভূষণ সার্থক ছোট গল্পকার আর গল্পচ্ছলেই তিনি হাজুর জীবনের দুটি পর্যায়কে এই গল্পে স্থান দিয়েছেন। হাজুর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়টি প্রধানতঃ আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দ্বিতীয়কে ভালো ভাবে জানতে গেলে,বুঝতে হলে প্রথমকে আরও বিশদে জানা অনেক বেশি প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা গল্পের প্রথম অংশটির বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হাজুর জীবনের প্রথম পর্যায়টিতে তাকে আমরা নিত্য অভাব - অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে দেখেছি। একটি ষোল - সতেরো বছরের অল্পবয়সী মেয়ে যার নিজের কিশোরীবেলা তখনও অতিবাহিত হয়নি সে ঐ বয়সে একটি দুবছরের শিশুপুত্রের জননী, স্বামীপরিত্যক্তা। যদিও এটি যে সময়ের গল্প সেই সময়ে খুব কমবয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হতো এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি গর্ভবতী হয়ে পড়তো। কিন্তু বেশিরভাগ পরিবারেই গর্ভবতী মায়ের যত্ন অথবা সন্তান প্রসবের পরবর্তী সময়েও প্রসূতির যত্নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকতো না। গ্রামীণ পরিবেশে এসব চিন্তাভাবনাও বিশেষ ছিলোনা। তার উপরে হাজুর পিতৃকুল ও পতিকুল উভয় দিকেই আর্থিক অবস্থা এতখানি দুর্বল ছিল যে, কোনক্রমে দিনযাপনটুকু তাঁদের কাছে সারসত্য; দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা তাঁদের কাছে অকল্পনীয়। স্বামী তাই নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে মায়ের কাছে রেখে দায়মুক্ত হয়েছে আর মেয়েটি যেহেতু বিবাহিতা হয়েও স্বামী পরিত্যক্তা তাই তার মাও তার কোন দায়িত্ব নিতে চাননি। তবে এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, হাজুর বিধবা মা অন্যের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে আরও দুটি ছোটছোট সন্তানকে প্রতিপালন করছেন তাই তার পক্ষে আরও দুজনের খাওয়াপরার দায়িত্ব নেওয়া যথেষ্ট কষ্টকর। উপায়ান্তর না দেখে তাই তিনি হাজুকে তার নিজের ব্যবস্থাটুকু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

গ্রামীণ অর্থনীতির একটি স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পটিতে। রীতিমত স্বচ্ছল অবস্থা না থাকলে কোন বাড়িতে একাধিক 'কাজের লোক' রাখা সম্ভবপর হয়না সেইকারণেই লেখক কাজ খুঁজতে আসা হাজুকে কাজে রাখতে পারেননি। মেয়েটি অসহায় হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে কিন্তু গ্রামীণ সংস্কৃতিতে অর্থসাহায্য করার থেকে খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি দানের চল বেশি। এই গল্পটিতে যে অংশটি বারবার,বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সেটি হল 'খিদে'। হাজু এবং হাজুর 'ক্ষুধাবোধ', তার শুধুমাত্র একটু খাবারের জন্য উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ - এই গল্পের পাঠক হিসেবে আমাদের যেন এক অদ্ভুত উলঙ্গ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সামান্য এক মুঠো চাল বা পাকা পেঁপে অথবা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর 'পোয়াটাক লঙ্কা' যা গ্রামবাংলার প্রতিটি ঘরের উঠোনে এমনি হয়ে থাকে – এইটুকু জিনিস নেওয়ার জন্য মেয়েটিকে 'চোর' অপবাদ পেতে হয়েছে। খিদের জ্বালায় মেয়েটি চাল, দুধ যা পেয়েছে তাই খেয়েছে; রান্না করা ভাত নয় একেবারেই কাঁচা চাল খেয়েছে সে। খিদের তাড়নায় একরকম বাধ্য হয়ে সে এইকাজ করেছে একথা বোঝা যায়। গল্পের কোথাও কিন্তু হাজু খাবার জিনিস ছাড়া অন্য কোন জিনিস চুরি করেছে এমন উল্লেখ নেই যার অর্থ হাজু স্বভাবে চোর নয়, সে শুধু খিদে সহ্য করতে পারেনা।খাবারের প্রসঙ্গ উঠলেই তার মুখে লজ্জামাখা হাসি ফুটে ওঠে। কোথাও কারো বাড়িতে পালাপার্বণে খাবার সুযোগ পেলে হাজু সেই সুযোগ হাতছাড়া করেনা কখনো এবং না করাটাই তার কাছে স্বাভাবিক কারণ যাকে প্রতিনিয়ত খাবারের সন্ধান করতে হয় তার কাছে এ ধরণের সুযোগ হাতছাড়া করা মানে বিলাসিতার নামান্তর।

আমাদের সমাজে মেয়েদের সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রচলিত ধারণা আছে।এই ধারণাগুলি আগেও যেমন ছিল বর্তমানেও একইভাবে আছে। হ্যাঁ, তার রূপ বা তীব্রতা হয়তো কিছুটা কমেছে কিন্তু সমাজের বুকে তাদের উপস্থিতি আজও রীতিমত বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। অসংখ্য প্রচলিত ধারণার মধ্যে একটি হল, মেয়েদের খিদে পেতে নেই। খুব ছোট্ট বেলা থেকে একটি মেয়েকে তার মা ও পরিবারের অন্যান্য মহিলা সদস্যেরা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন যে, মেয়ে হয়ে জন্মেছে মানেই তার খিদে সমবয়সী একটি ছেলের থেকে কম হতে হবে। রান্নাঘর থেকে তার জন্য যেটুকু বরাদ্দ করা হবে সেটা নিয়েই তাকে তুষ্ট থাকতে হবে। যেকোনো ভালো, পুষ্টিকর খাদ্যে প্রথম অধিকার বাড়ির পুরুষের। সবার খাওয়া হলে তারপরে যেটুকু উচ্ছিষ্ট, অবশিষ্ট পড়ে থাকবে তাই দিয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করবেন ঘরের বউ-ঝিরা। এরকম নিয়মই বহুকাল বাড়ির অন্দরমহলে চলে আসছে। 'খিদে সহ্য করা', 'খিদের কথা না বলা' - এগুলি লক্ষীমন্ত নারীর

লক্ষ্মণ আর 'নিজের পচ্ছন্দমত খাবার খাওয়া বা খেতে চাওয়া', 'যখন খুশি দিনের যেকোনো সময়ে খাওয়া' – এগুলো হল অলক্ষ্মীর উদাহরণ। কথাতেই আছে 'মেয়েমানুষের বেশি লোভ ভালো নয়'। অবাক লাগে মানুষ পদবাচ্য হয়েও, 'মনুষ্য' রূপে গণ্য হলেও মেয়েরা সেই 'মেয়েমানুষ'ই থেকে যায়। সমাজের চোখে পুরোপুরি মানুষ বোধহয় তারা হয়ে উঠতে পারেনি আজও।

বেচারি হাজু নিজের খিদের বোধটাকে কম করতে পারেনি,পারেনি খাবার জিনিসের প্রতি নিজের আকর্ষণ,লোভকে সংযত করতে আর তাই এই সমাজের তথাকথিত সুসভ্য নাগরিকেরা তাকে 'চোর' অপবাদ দিয়েছে। বারবার প্রশ্নের পরেও যখন লেখক কোন সদুত্তর পাননি তখন নিজেই অবাক হয়েছেন যে, বাড়ির বৌ হাঁড়ি থেকে ভাত খাওয়ার মতো সামান্য কারণটি এই সমাজে অপরাধ বলে গন্য হয় এবং মেয়েটিকে তার স্বামী পরিত্যাগ করে। লঘুপাপে গুরুদণ্ডের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই ঘটনাটি।

হাজুর জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় হাজু পতিতাপল্লীতে নাম লিখিয়েছে।এইভাবে জীবন অতিবাহিত করে সে। 'বেশ্যা', 'দেহপশারিনি'[৮] সে। লেখক তার পরিচিত, একদা খেলার সঙ্গী বন্ধুকন্যার এহেন অধঃপতনে খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে মহকুমা শহরে কাজের সূত্রে গিয়ে হাজুর সাথে লেখকের আবার দেখা হয়। সে সাদরে 'জ্যাঠামশাই' সম্বোধনে তাঁকে ডেকে পরিচয় দিলেও লেখক তাঁকে চিনতে পারেননি। হাজু কিন্তু খুব সহজ, স্বাভাবিক স্বরে নিজের বর্তমান পরিচয় জানায় যে সে 'শহরের নটী' হয়ে রয়েছে। হাজুর ঐ বক্তব্যটিতে লেখকের মনে হয়েছিল-

> "এমন সুরে সে শেষের কথাটি বলিল, যেন জীবনের পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য সে গর্ব অনুভব করে।"[৯]

হাজু লেখককে একরকম জোর করেই নিজের নতুন গৃহস্থালী দেখাতে উৎসুক হয়ে ওঠে। নিরুৎসাহী লেখক ধীরে ধীরে গ্রাম্য মেয়েটির বারবার অনুরোধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। হাজুর সারল্যমাখা আবদারে একরকম বাধ্য হয়েই লেখক তার ঘরে ঢোকেন। মাঝারি মাপের একটি ছোট ঘর, তক্তাপোষের উপরে পরিষ্কার চাদর পেতে রাখা, একটি জলচৌকির উপরে সামান্য কয়েকটি পিতল - কাঁসার বাসন আরও কিছু আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, একটি কৃষ্ণের ছবি এছাড়াও ডুগি-তবলা, হুঁকো, তামাক - টিকে ইত্যাদি নানারকম প্রয়োজনীয় বা তুলনায় কম প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েই হাজু তার নতুন সংসার সাজিয়ে নিয়েছে। লেখক কথায় কথায় জেনেছেন এই ঘরের ভাড়া সাড়ে সাত টাকা। বহু অনুরোধ - উপরোধের পরে লেখককে সামান্য জলযোগ করাতে রাজি করে সে। নিজের কেনা পেয়ালায় চা বানিয়ে খাওয়ায় তাঁকে। একজন দেহ পশারিনির ঘরে বসে খাদ্যগ্রহণে প্রাথমিক ভাবে তীব্র বিবমিষা অনুভব করেছেন লেখক কিন্তু তাঁর যাবতীয় সঙ্কোচ,ঘৃণা হাজুর সারল্যের সামনে ভেসে গেছে। হাজুর ব্যবহার, তাঁর কথা দেখে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন আসল সত্য।

নিজের বেঁচে থাকাটাই যখন প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায় তখন বেশিরভাগ মানুষের কাছে ন্যায়নীতি, ঠিক - ভুল সব কিছু মিথ্যে হয়ে যায়। সব কিছুর উরদ্ধে তখন জীবনধারণই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের পরিবেশে হাজু হয়তো কোনক্রমে দাসীবৃত্তি করে নিজের সন্তান এবং নিজের বেঁচে থাকাটুকু চালিয়ে নিতে পারতো কিন্তু বাধ সাধল দুটি বিষয়। প্রথমতঃ হাজুর ক্ষুধাবোধ। খিদে সহ্য করতে না পেরে মাঝেমাঝেই সে চুরি করতো। লোকে তাকে 'চোর' অপবাদ দিলেও সে স্বভাবের চোর নয়; অভাবের চোর। কারণ খাবার ছাড়া তাকে আমরা অন্যকিছু চুরি করতে দেখিনি। সরল হাজু বুঝতে পারেনি 'মেয়েমানুষ' হয়ে 'খিদে পাওয়া' আর 'খাবার জিনিস চুরি করা' গুরুতর অপরাধ। চুরি অবশ্যই অপরাধ এবং কোন স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় হাজুর চুরির অভ্যাস ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছিল উপায়ান্তর না পেয়েই সে বেশ্যাবৃত্তি বেঁচে নেয়। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চাশের মন্বন্তর। যে তীব্র খাদ্যাভাব, খাদ্যকষ্ট সেই সময় বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছিল তার মর্মন্তুদ উল্লেখ বহু কবি - সাহিত্যিক করেছেন। স্বয়ং বিভূতিভূষণের *'অশনি সংকেত'*-এই এর হৃদয়বিদারী জলন্ত উদাহরণ রয়েছে। অসংখ্য মানুষ একমুঠো চালের জন্য হাহাকার করেছে। সেখানে হরি কাপালির ছোট বৌয়ের চরিত্রটি রয়েছে। যে খিদের জ্বালায় অন্যের পুরুষের সাথে যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হয়। গ্রামের পোড়া-যদু তাকে সাধ্যমতো চালের

যোগান দেয় বিনিময়ে মেয়েটি তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে। অনঙ্গ-বৌয়ের তিরস্কারের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট বৌ অবলীলায় উচ্চারণ করে জীবনের নগ্ন সত্য-

> "-বলো গে তুমি বামুন-দিদি।তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমি এতদিন জবাব দিই নি। আর পারি নে না খেয়ে- না খেয়েই যদি মলাম, তবে কিসের কি? আমি কোনো কথা শুনবো - চলি বামুনদি, পাপ হয়ে নরকে পচে মরবো সেও ভালো।"[১০]

হাজুকে হয়তো শেষ পর্যন্ত বেশ্যাবৃত্তি নিতে হতোনা। কোনরকমে চেয়ে - চিন্তে হয়তো সে জীবন চালিয়ে নিত কিন্তু এই সর্বগ্রাসী মন্বন্তর বহু মানুষের জীবন ও স্বপ্নের সাথে সাথে একটি নিতান্ত সাধারণ গ্রাম্যবালিকার জীবনধারণের পথটিকে হঠাৎ করেই পঙ্কিল করে তুলেছিল। সমালোচক এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "মন্বন্তরের ১৯৪৩ নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের পরম ভ্রমণব্যস্ত বছরগুলির একটি। কিন্তু এই তথ্য থেকে এমন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আমার উদ্দেশ্য নয় যে, সামাজিক সচেতনতায় বিভূতিভূষণ ছিলেন একেবারে রিক্ত। তবে কোনদিনই তিনি সমগ্রের সান্ত্বনা খুঁজবার অভিলাষে নিজের অপরিচিত কোন জীবন প্রবাহকে, নিজের নাগালের বাইরের কোনো তত্ত্ব, আদর্শকে সাহিত্যের বিষয় বানাতে চাননি।আর জীবনের শেষ দশকে এমনি হল তাঁর দেশের অবস্থা যে, 'বিভূতিভূষণের আবাল্য চেনা গ্রামের মেয়েবউকে পেটের খিদেয় জ্বলতে জ্বলতে শহর - কলকাতায় আসতে হল - লড়াই নাকি পেটের খিদের আর শরীরমনের ইমানের।"[১১]

হাজুর কাছে নিত্যদিনের যন্ত্রণাভোগের থেকে এই পথটি প্রশস্ত বলে মনে হয়েছিল। তার কোনরকম মনোবেদনা অথবা পাপবোধের উল্লেখ কিন্তু লেখক গল্পে একবারের জন্যও করেননি বরং বারবার তিনি তার মুখের অনাবিল হাসি, তার আনন্দ - তৃপ্তির কথা বলেছেন। হাজুর জীবনের এই পর্যায়ে কোন খাদ্যাভাব নেই। উপরন্তু সে জানায় দুবেলা চা না খেলে সে কাজ করতে পারেনা, দোকানের বহুধরনের সুখাদ্য খেয়ে খেয়ে তার অরুচি হয়েছে। খাবারের কোন চিন্তা না থাকায়, কষ্ট না থাকায় সে নিজের শিশুপুত্রটিকে নিজের কাছে এনে রাখার মনস্থ করেছে। গ্রামের যে সব লোকেরা শহরের নিষিদ্ধ পল্লিতে আসে, তাদের মধ্যে কারো কারো হাত দিয়ে হাজু মায়ের জন্য কাপড়-টাকা ইত্যাদি পাঠিয়ে দেয় কিন্তু সে সরল- নিরক্ষর বলে, তার খোঁজ নেওয়ার কোন উপায় না থাকায় সহজেই তাকে ঠকানো যায়। বড় অদ্ভুত লাগে মানুষের এই হৃদয়হীনতা,এই হীনপ্রবৃত্তি। লেখক ভেবেছিলেন হাজুকে শাসন করে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু জীবন বড় বিস্ময়কর। ভুয়োদর্শী লেখকের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায় হাজুর বাস্তবতার সামনে। তিনি বুঝতে পারেন জীবনের সত্য। কাকে তিরস্কার করবেন তিনি? নিজেই অনুভব করেছে সে কথা –

> "যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে সে পরম হিতৈষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়।"[১২]

সত্যিই তো, সবে বাঁচতে শিখেছে যে মেয়েটিকে তাকে তো জাগতিক বাস্তবতাই বাধ্য করেছে এই পথ বেছে নিতে।আর তার প্রতি অকারন রূঢ়তা দেখা চায়নি লেখকের মন।

লেখক সমস্ত কিছু দেখে শুনে নিজে উপলব্ধি করেছেন যে, জীবনের নিয়ম সবার জন্য সমান নয়। যার সামনে জীবন যেভাবে এসে উপস্থিত হয় তাকে সেইভাবে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়। গ্রামে একবারেই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করা মেয়েটি আজ খুব সামান্য হলেও নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে। সুখ নয়; স্বচ্ছল জীবনের মুখ দেখেছে সে। একজন নারীর জীবনের সাধারণভাবে তিনটি পর্যায় – কন্যা – জায়া - জননী। হাজুর জীবনেও এই তিনটি পর্যায় রয়েছে।তার মধ্যে কন্যা ও জননী এই দুটি প্রধান হয়ে উঠেছে। নিজের 'জায়া' পরিচয়টি হাজু তার জীবনের প্রথমভাগেই ফেলে এসেছে কারণ তার স্বামী তাকে ও তার সন্তানকে ত্যাগ করেছে। যে কারণেই হোক তার স্বামী

দায়িত্ব পালনে অপারগ; তাকে নিজেকেই দুজনের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সেজন্য তার এই দিকটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু একজন মা এবং একজন মেয়ে হিসেবে এই দুটি দিকেই সে দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে তার নিজের মতো করে। স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে একজন বেশ্যার কাজের কোন নৈতিকতা আছে কি? কিন্তু তার উত্তরে বলা যায়, মেয়েটি বেশ্যা হয়েছে ঠিকই, যেটুকু স্বচ্ছলতার মুখ সে বর্তমানে দেখেছে সবটাই তার দেহের বিনিময়ে কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে সে কিন্তু নিজের অতীত ভুলে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যায়নি। প্রথমে নিজের সন্তানকে নিজের কাছে এনে রাখতে চায়নি। হ্যাঁ, কোন মা চাইবেনা নিজের সন্তানকে এরকম অসুস্থ পরিবেশে রেখে বড় করতে কিন্তু মা বলেই সবার উপরে তার কাছে নিজের সন্তানের ভালো থাকার বিষয়টি বড় হয়ে ওঠে। খাবার কষ্ট নেই বলেই হাজু নিজের ছেলেকে তার কাছে এনে রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে নিজের মায়ের দুঃখ - দুর্দশা কমানোর জন্য সে তার গ্রামের লোকেদের (যারা তার কাছে আসে) হাত দিয়ে সাধ্যমত টাকা পাঠিয়ে দেয়। লেখক তার মায়ের কাছে গিয়ে জানতে পারেন হাজুর পাঠানো এর আগের কোন টাকাই তার মা পায়নি তাই তিনিও হাজুর নাম না করেই টাকা দিয়ে দেন। কারণ তাঁর কাছে নিজের সম্মানে প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছিল।

বিভূতিভূষণ গল্পের নাম দিয়েছেন 'বিপদ'। গল্পটি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় প্রকৃত বিপদ কোনটি? কিসের কথা বলতে চেয়েছেন তিনি? গ্রাম্য পরিবেশে বসবাস করার কারণে লেখক তাঁর আজন্মলালিত সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। একটি অসহায়, সাহায্যপ্রার্থী মেয়ের সম্বন্ধে প্রথম আলাপে তিনি বিশেষ খোঁজ-খবর নিতে চাননি বরং বিষয়টিকে তাঁর 'হাঙ্গামা' মনে হয়েছে কারণ সেই মুহূর্তে তাঁর লেখায় বিঘ্ন ঘটছিলো। গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন স্থায়ী সমাধান করতে পারেননি হয়তো গ্রামীণ অর্থনীতি এর কারণ। আবার আরেকটি বিষয় গ্রামেরই একটি মেয়ে বেশ্যাপল্লীতে গিয়ে নাম লিখিয়েছে তিনি লোকমারফৎ খবর পেয়েছেন এর থেকে মনে হয় গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে লেখকের বিশেষ কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। নিজের বাবার বন্ধুস্থানীয় বলেই হাজু কিন্তু লেখককে 'জ্যাঠামশাই' সম্বোধন করেছে; শুধু তাইই নয় সে লেখককে নিজের অভিভাবকের স্থান দিয়েছে।

সাধারণতঃ একরকম অনন্যোপায় হয়ে পতিতাবৃত্তি নেয় যে মেয়েরা তাদের সমাজের প্রতি, সংসারের প্রতি একটা স্বাভাবিক ক্রোধ-ক্ষোভ থাকে। বাকিদের মতোই সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন না পাওয়ার বঞ্চনাবোধ থাকে অথচ হাজুর কিন্তু সেরকম কোন ক্ষোভ বা অভিমান নেই কারো প্রতি। সে অনায়াস অধিকারবোধে লেখকের উপরে জোর করেছে, অনুরোধ করেছে লেখক যেন সময় - সুযোগ মত তার কুশল জেনে যান। অন্নবস্ত্রের নিরন্তর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেহকে পণ্য করা তার সহজ মনে হয়েছে। এখানে সে স্বাধীন; তাকে নিজের ইচ্ছেমত খাবার খেতে কেউ বাধা দেওয়ার নেই। নিজের 'দেহবিক্রী'-র অর্থে সে নিজের ভালো থাকা কিনেছে। একদিন খিদের জ্বালায় কাঁচা চাল খেতে বাধ্য হওয়া মেয়েটি আজ নিজের অভিভাবকসম লেখককে আপ্যায়ন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। পতিতাগৃহে বসে খাবার খেতে লেখকের রুচিতে বাধলেও তিনি হাজুর সারল্যের কারণে খেয়েছেন ঠিকই কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে কোথাও যেন সেই সংস্কার রয়েই গেছে। যেকারণে হাজুর কষ্টার্জিত টাকা অন্যেরা ঠকিয়ে নিচ্ছে, হাজুর অসহায়া দরিদ্র মা সেই সাহায্য পাচ্ছেন না জেনেও নিজের সম্মান হারানোর ভয়ে, লোকলজ্জার ভয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত সত্যিটুকু কাউকে বলেন নি। সত্যিই তো বিপদ কি? হাজুর মতো মেয়ে যে খিদে সহ্য করতে পারেনা নাকি হাজুর বেশ্যাপল্লীতে নাম লেখানোকে বিপদ বলেছেন লেখক? একজন মেয়ের এহেন ঘৃণ্য পেশা বেছে নেওয়াকে তাঁর বিপদ মনে হয়েছে। কারণ সমাজের মানুষদের প্রয়োজনেই আদিমতম এই পেশা আজও বর্তমান অথচ নিজের পরিচিত কেউ এই পেশায় এলে আমরা তার সাথে পরিচয়ের সুতোটুকু কেটে ফেলতে দুবার ভাবিনা; এখানেও লেখক তাঁর ব্যতিক্রম নন। তাই হাজুর সাথে পরিচয় তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিড়ম্বিত করেছে তাঁকে। যা লেখকের কাছে বিপদের নামান্তর। নাকি হাজুদের মত মেয়েদের অবস্থার জন্য সমাজ দায়ী? সমাজের নিয়মটাই হাজুদের সামনে 'বিপদ' হয়ে দাঁড়িয়ে বাধ্য করে তাঁদের পতিতাবৃত্তি বেছে নিতে। এরকম অনেক প্রশ্ন অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের সামনে রেখেছেন বিভূতিভূষণ আর জীবনবোধের চিরন্তন প্রশ্নে বারবার মানুষের বেঁচে থাকার সুতীব্র ইচ্ছাই জয়ী হয়।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বর্ষাযাপন', 'সোনার তরী', শান্তিনিকেতন, ১২৯৯
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিপদ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৩৭১, পৃ. ১০১
৩. তদেব, পৃ. ১০১
৪. তদেব, পৃ. ১০১
৫. তদেব, পৃ. ১০২
৬. তদেব, পৃ. ১০২
৭. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৪
৮. 'বেশ্যা' – Prostitute (noun) 'a person who has sex for money', Oxford Learner's Dictionary. অর্থ অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন যাঁরা।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিপদ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৩৭১, পৃ. ১০৪
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অশনি-সংকেত', অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম 'অমর' সংস্করণ, পৌষ ১৩৭১, পৃ. ৭১
১১. সেন, রুশতী, 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৩৪
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'বিপদ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, দশম মুদ্রণ ১৩৭১, পৃ. ১০৪